জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানি নাগরী লিপির প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বৃহত্তর সিলেট জেলা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক*
ফাতেহা বেগম**

Abstract

Sylheti Nagri script is a language and script with completely unique characteristics. Although it was lost in the course of time,its influence in the social system of that time was not reduced in any way. The Nagri script was a unique symbol of the individual and cultural independence of Muslim community of Sylhet. This script was not only a script but it was a consciousness or a culture. Infact Sylheti Nagri script is the name of simple bangali script based on Muslim tradition. The Muslim community of Sylhet is mainly the inventor, nurturer and patron of this urban script.

চাবিশব্দ:সিলেট, মুসলমান, নাগরী, লিপি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি

ভূমিকা

১৩০৩ সালে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র.) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিলেট জয় করেন। ফলে সিলেটে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তখন স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা ছিল দেবনাগরীজাত সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ। আবার বিজয়ী মুসলিমগণের ভাষা ছিল আরবি ও ফার্সি মিশ্রিত। ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যার তাৎক্ষণিক ফল ছিল সিলেটি মুসলমানি নাগরী লিপির উৎপত্তি। হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে এই লিপি সিলেটের মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটায়। এই লিপি উদ্ভবের ফলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গঠনমূলক ও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ধর্মপ্রচার, সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিলেটি কথ্যবুলি এবং নাগরী লিপি ছিল মুসলমানদের প্রধান বাহন। এমনকি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মুদ্রায় নাগরী লিপির অস্তিত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও এর প্রভাব সুস্পষ্ঠভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই নাগরী লিপি ছিল সিলেটের মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অনন্য নিদর্শন। এই লিপি কেবল একটি লিপিই ছিলনা বরং তা ছিল একটি চেতনা বা কালচার। আলোচ্য প্রবন্ধে সিলেটে মুসলমানি নাগরী লিপির উৎপত্তি এবং সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

নাগরী লিপির পরিচয়

চতুর্দশ শতকে সিলেটে মুসলমানগণ কর্তৃক 'নাগরী ভাষা' নামে একটি উপভাষা জন্ম নেয়। এ ভাষা লিখন পদ্ধতি, বর্ণমালা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর সহজ বাংলা লিপির নামই সিলেটি লিপি। হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
** লেখক ও গবেষক

প্রভাবের ফলে এই লিপির উদ্ভব ও প্রচলন হওয়ায় কেউ কেউ এটাকে 'জালালাবাদী লিপি' হিসেবেও চিহ্নিতকরেছেন। এটি মূলত কথ্য ভাষা ছিল। স্থানীয় লোকজনের কথ্য বুলির সাথে বিজয়ী জনগোষ্ঠির ভাষা আরবি- ফার্সির সমন্বয় ঘটিয়েই এই ভাষার উৎপত্তি। তবে মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর এই লিপি স্থানীয় দেবনাগরী লিপির প্যারালাল হিসেবে'মুসলমানি নাগরী' তথা'সিলেটিনাগরী' নামে সমধিকপরিচিত।[১] সিলেটের মুসলিম সমাজ প্রধানত এই নাগরী লিপির উদ্ভাবক, লালনকারী ও পৃষ্ঠপোষক।

বর্ণপরিচয় ও অন্যান্য ভাষার প্রভাব: আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাষা যুক্তক্ষর বর্জিত। সিলেটি নাগরীতে ও যুক্তাক্ষর নাই। অক্ষর সংখ্যা ৩২, স্বর চিহ্ন ৫টি।[২] উদাহরণস্বরূপ-

সিলেটি নাগরীবর্ণ	বাংলা বর্ণ
↗	আ
ছ	ই
ও	উ
ট	এ
×	অ

মুসলমানগণ কর্তৃক সিলেট বিজয়ের সাথে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার উপর আরবি ও ফার্সি ভাষার প্রভাব পড়তে শুরু করে। হিন্দুয়ানী অনেক শব্দের মুসলিম রূপান্তর হয়। যেমন্ 'জল' মুসলমানদের কাছে 'পানি' এবং 'স্নান' গোসল হয়ে গেল। অযু, নামায, রোযা, সালাত, হালাল, হারাম, যিয়ারত, প্রভৃতি অসংখ্য আরবি/ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। নাগরী ভাষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড.এস. এম. গোলাম কাদির লিখেছেন-"সিলেটি নাগরীর বর্ণ বাছাই ও বিন্যাসে আরবি বর্ণমালার বিন্যাসিক অবস্থান ও উচ্চারণগত প্রভাব পড়েছে প্রচুর। সিলেটি উপভাষার উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করেছে মূলত ফার্সি (উর্দুর) প্রভাব। সিলেটি উপভাষার উচ্চারণ তথা সিলেটি নাগরী লিপি ও উচ্চারণ বিশ্লেষণে ফার্সি (উর্দুর) উচ্চারণ প্রভাবকেও তাই আরবি বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশ ভিন্ন বিকল্প নাই"।[৩] নাগরী পুঁথির শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক ও গবেষক কবি মোহাম্মদ সাদিকের ভাষ্য মতে "সিলেটি লিপিতে রচিত পাণ্ডুলিপির অবয়বে সেমেটিক প্রভাবের দিকটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। অর্থাৎ সিলেটি লিপির কিছু কিছু নমুনায় লিপিকারগণ আরবি ও ফার্সি ক্যালিওগ্রাফির নিকটবর্তী থাকার প্রয়াস পেয়েছেন। উৎস বিচারের ক্ষেত্রে এ লিপির স্টাইল ও স্ট্রোক বিচারের বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য"[৪]।

সিলেটি নাগরী হরফ 'ط'আরবি 'ط এর মত। কেবল মাত্রা যোগ করতে হয়। এ ছাড়া নাগরী , X, Y, Oআরবিو.ا ও আরবি যতিচিহ্ন' ة ' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অনুরূপ সিলেটি নাগরীর নিজস্ব হরফ ' ↗ ' (আ), '⌅ (র), '১' (ল) প্রভৃতি আরবি যযম এর সাথে মাত্রা যোগ করে লিখতে হয়। এসব কারণেও সিলেটি নাগরী লিপি মুসলমানি নাগরী বলে চিহ্নিত।

সিলেটি নাগরী লিপি প্রবর্তনে আরবি ও ফার্সি ভাষা মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করলেও ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা, যেমন– কাইথি, দেবনাগরী, আফগান ও পূর্ব ভারতীয় বাংলা লিপির প্রভাব নেহায়েত কম ছিলনা। উল্লেখ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে মূল "নাগরী " লিপির জন্ম। এই নাগরী থেকে জন্ম লাভ করে দেবনাগরী,কাইথী ও গুজরাটি লিপি। ব্রাহ্মণরাজপুতেরাই এর স্রষ্টা। এসব ভাষা ছিল হিন্দু ধর্ম ঐতিহ্য নির্ভর।[৫] ভারতে মুসলমানদের আগমনের ফলে ব্যাপক সংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু এসব ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মাতৃভাষা

পরিবর্তন হয়নি। আবার নবাগত মুসলমানদের ভাষার সাথেও তাদের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে তাদের প্রচেষ্টায় স্থানীয় এবং প্রচলিত ভাষার কিছু বর্ণও সিলেটি নাগরী লিপিতে অন্তর্ভূক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে আরবি, ফার্সি, বাংলা, কাইথি, দেবনাগরী, আফগানী প্রভৃতি ভাষার লিপি থেকে কিছু কিছু হরফের নমুনা সংগ্রহ করে সিলেটি নাগরী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিজস্ব একটি লিপিমালা সৃষ্টি করে, যা এই ভাষাকে গতিশীল ও প্রাণান্ত করে তোলে। সিলেটি কথ্য নির্ভর এই লিপি গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ভাষা সহজে আয়ত্ব করা যেত, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হতো না। ফলে ধীরে ধীরে তা এতদঞ্চলের সব শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

নাগরী লিপির উদ্ভব

হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র.) ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট বিজয় করার পর সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন। কসবে সিলেটেই গড়ে ওঠে তাঁর খানকা ও লঙ্গরখানা। এই খানকাই ছিল তৎকালীন এ অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। এখানে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা হত। খানকার আশ-পাশের লঙ্গরখানায় খাবারের সময় ঢাক ঢোল পিটিয়ে সংশ্লিষ্টদের জানান দেয়া হলে অনেক লোক খাবার গ্রহণ করত। পাশাপাশি তাদেরকে গণশিক্ষার আওতায় আনারও ব্যবস্থা করা হয়।[৬] কিন্তু তৎকালীন সিলেটে প্রচলিত হিন্দু ঐতিহ্য নির্ভর জটিল দেবনাগরী ও জটিল বাংলা লিপি দ্বারা বহুভাষিক এ সকল মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিলনা। এ কারণে ঐ জনগোষ্ঠীর ও স্থানীয় এবং আশ-পাশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর (এদের সকলকে নিয়ে গড়ে উঠে মুসলিম কমিউনিটি) দ্বারা বহু ভাষার লিপির নমুনা সমন্বয়ে সহজবোধ্য ও সহজে লিখিত-পঠিত একটি বিকল্প ভাষা ও লিপির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ছাড়া দেবনাগরীজাত হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে মুক্তি লাভ করতে স্বকীয় সাস্কৃতিক স্বাধীনতা হাসিলের লক্ষ্যে সহজতর মুসলমানি নাগরী লিপির সৃষ্টি করা হয়। হিন্দুয়ানী কথ্যবুলিকে মুসলমানি বাংলার আদলে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধ করা হয়। সিলেটি জনগণ নাগরীর বাংলা ভাষাকেই স্বকীয় ভাষাহিসেবে গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং বাংলা ভাষার ইতিহাসে সিলেটি নাগরীর উদ্ভাবন এক যুগান্তকারী ঘটনা। নাগরী লিপির উদ্ভব, প্রচলন ও গ্রহণযোগ্যতার পেছনে হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার যে আশীর্বাদ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এমনকি ৩৬০ আউলিয়ার কেউ কেউ যে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এর প্রমাণ সিলেটি নাগরী লিপিতেই বিদ্যমান আছে।

ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল মুসাব্বির ভূঁইয়ার মতে, “The history of the Advent of Islam and Sufism in also connected with the history of the script”[৭]। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক জগমল সিং ড. মুসাব্বির ভূইয়ার সূত্র ধরে বলেন, “Dr. A S. M Bhuiya’s is of opinion that this language and script came in to existence during the time of Shahjalal.”[৮]।

প্রকৃতপক্ষে হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার নেতৃত্বাধীন মুসলিম সমাজ নাগরী তথা মুসলমানি নাগরী সৃষ্টি পূর্বক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামিকরণ করে মুসলমানি বাংলারই (ভাষা ও সাহিত্যেরই) কেবল গোড়াপত্তন করেননি; বরং হিন্দু ঐতিহ্যনির্ভর দেবনাগরীর প্যারালাল মুসলমানি নাগরীরও গোড়াপত্তন করেন।তাঁরা বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ সিলেটি কথ্যবুলিকেও মুসলমানি বাংলায় ঢেলে সাজান। সিলেটি নাগরীর মাধ্যমে হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়া বহুজাতিক (রাষ্ট্রীয়) বহু ভাষিক জাতি সমুহকে তাদের কর্মস্থলে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন এতদঞ্চলের সমাজ বদলের রূপকার। কারণ, সিলেটি নাগরী এবং কথ্যবুলি ছিল তৎকালীন সমাজ বদলের ও নতুন সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার[৯]।

নাগরী লিপির ক্রমবিকাশ

১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটে সংগঠিত ইসলামি বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত ভাষা সংকট মুকাবিলার লক্ষেই সিলেটি নাগরী তথা মুসলমানি নাগরীর উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালেও এর লালন ও বিকাশ সাধিত হতে হতে উনবিংশ শতাব্দীতে তা স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে। নাগরী সমগ্র সিলেট ও আসামের কাছাড়ের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সিলেটি নাগরী ভাষার মুখ্য অংশই ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান কাহিনি বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে। মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক বিষয়, মরমী প্রেম ও রোমান্টিক কাহিনির সন্ধানও মিলে এ ভাষায়। দলিল দস্তাবেজে অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও সরকারী কার্যকলাপে তা তেমন একটি ব্যবহৃত হয়নি। মূলতসূফি-সাধক ও ফকির-দরবেশগণ নাগরী লিপিতে সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁদের হাতেই এই লিপির তথা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। এ জন্য নাগরী সাহিত্যকে ফকিরি ধারার সাহিত্যও বলা হয়। এ সম্পর্কে নাগরী গবেষক কবি মোহাম্মদ সাদিক বলেন, "সিলেটি নাগরী লিপির চর্চা ও বিকাশ সাধিত হয় মূলধারার মুসলমান অর্থাৎ ফকির দরবেশদের দ্বারা। এ সকল ফকির-দরবেশ সমাজে সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা কোনোভাবেই সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষ ছিলেননা।[১০] একথা বলাই বাহুল্য যে, পীর ফকির দরবেশদের মর্যাদা ছিল সমাজে সবার উপরে এবং সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের উপর তাঁদের প্রভাব ছিল ব্যাপক। ফলে তাঁদের হাতে বিকশিত নাগরী লিপি যে সিলেটের তৎকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নাগরী লিপির প্রভাব

চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে উদ্ভূত হয়ে প্রায় দু'শ বছরের গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্যে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এই লিপি সিলেটের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। আরাকান রাজ সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২ খ্রি.) পনের শতকেই আরবি, ফার্সি ও নাগরী লিপিতে মুদ্রা চালু করেন।[১১] দিনারপুরের বড় খান,[১২] কুরেশী মাগন ঠাকুর (পীর বখশ খান)[১৩] ও তরফের সৈয়দ মুসা[১৪] প্রমুখের প্রভাবেই চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে নাগরী লিপি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এছাড়া আফগান শাসকগণও তাঁদের মুদ্রায় সিলেটি লিপি উৎকীর্ণ করে এ লিপির প্রতি সম্মান জানিয়েছিলেন।[১৫]

সাহিত্য চর্চায় নাগরী লিপির প্রভাব

চতুর্দশ শতকে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক কাল পর্যন্ত কয়েক'শ বছর সিলেটি নাগরী সাহিত্য সিলেটের গ্রামীণ সাহিত্য রসিক জনগোষ্ঠীর পিপাসা নিবৃত্ত করেছে। আরবি, ফার্সি ও বাংলা সাহিত্য রচনার পাশাপাশি মুসলমানি নাগরী সাহিত্য চর্চা সিলেটি সাহিত্য চর্চাও ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক হলায়ূদ মিশ্র নাগরী লিপিতে 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬] মৌলভী বাজারের লংলার অধিবাসী কবি গোলাম হুসন (জন্ম ১৪৬৮ খ্রি.) 'তালিব হুসন' নামে নাগরী লিপিতে কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।[১৭] প্রথম দিকের নাগরী সাহিত্যেকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি সৈয়দ শাহ হুসন আলম (১৫০০-১৬৫০ খ্রি.) তিনি সিলেটি নাগরী লিপিতে 'ভেদশার' ও 'রিছালাত' নামে দু'খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন । মহাকবি সৈয়দ সুলতান তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচনা থেকে এর প্রমাণ পাওয় যায়-

"আল্লার নাম আগে মনে করি শার
পরথমে আগাজ পুথি নামে ভেদশার "।[১৮]

প্রখ্যাত মরমী কবি শাহনূর (১৭৩০-১৮৫৮ খ্রি.) নাগরী লিপিতে 'নূর নসিহত' 'রাগনূর' 'নূরের বাগান', 'সাত কন্যার বাখান' ও মনিহার নামে পাঁচ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়ে সিলেটি নাগরী খুব জনপ্রিয় ছিল। তাই কবি লিখেছিলেন

"আরবি ফারসী কেহ বুঝিতে না পারে
নাগরী করে লিখে দিলু সবে বুঝিবারে"।[১৯]

মধ্য যুগের অন্যান্য নাগরী সাহিত্যেকদের মধ্যে কবি শেখচান্দ, দীন ভবানন্দ, ভেলা শাহ, শাহ আছদ আলী, শেখ বানু অন্যতম।

নাগরী লিপির স্বর্ণযুগ

সূফি বা ফকিরি ধারার নাগরী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ শুরু হয় আঠারশ শতকে। এ সময়ের নাগরী লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুন্সি সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২ খ্রি.)। নাগরী লিপিতে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো হালতুন্নবী', রদ্দেকুফূর', 'হাসর মিসিল', 'মহব্বতনামা', প্রভৃতি। 'হালতুন্নবী' নাগরী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও 'হালতুন্নবী' ঘরে ঘরে পঠিত হতো।[২০] আধুনিক যুগেও বহু লেখক নাগরী লিপিতে সূফি বা ফকিরি ধারার সাহিত্য রচনা করেন। তাদের মধ্যে আশরাফ হোসেন সাহিত্য রত্ন, চৌধুরী গোলাম আকবর, সৈয়দ মুর্তজা আলী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, আব্দুল হামিদ মানিক, ফাতেমা চৌধুরী, মতিয়ার রহমান চৌধুরী ও কবি মোহাম্মদ সাদিক উল্লেখযোগ্য।[২১]

নাগরী লিপি ও সাহিত্যের প্রকাশনা শিল্প

উনবিংশ শতকের পূর্বে নাগরী শুধু হাতে লিখা হতো। টাইপ না থাকার দরুণ সিলেটি নাগরীতে বই ছাপানো সম্ভব ছিলনা। সিলেটের কৃতি সন্তান মরহুম মুন্সি আব্দুল করিম সর্বপ্রথম নাগরী অক্ষরের টাইপ চালু করেন ও পুস্তক ছাপানোর কাজে হাত দেন। সিলেটে 'ইসলামিয়া প্রেস' (১৮৬০-৭০) 'সরদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' এবং কলকাতায় আপার চিৎপুর রোডের রতু সরকার লেনে 'জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে' অনেক নাগরী পুস্তক ছাপা হয়।[২২] বর্তমানে ড. সোলয়েড উইলিয়ামস ও জেমস লয়েড উইলিয়ামস নামক দু'জন বিদেশি কম্পিউটারে নাগরী ফন্ট (সুরমা) প্রবর্তন করেছেন।[২৩] এছাড়া Mr. Roger Gwymn (ইংল্যান্ডের নাগরিক), সিলেটের ফুলবাড়ির মি. আব্দুল জলিল চৌধুরী এবং বার্মিংহাম প্রবাসী ছাতক থানার এম এ হামিদের প্রচেষ্টায় নাগরী হরফের কম্পিউটার ফ্রন্ট প্রস্তুত করা হয়।[২৪]

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব

সিলেটি নাগরী লিপি উদ্ভবের পর তৎকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্মান্তরিত মুসলমান ও বহিরাগত মুসলমান জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নাগরী লিপি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এমনকি নারীগণও খুব সহজেই এই লিপির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। যা তৎকালীন সমাজে নারী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। তাছাড়া নাগরী লিপিতে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে লোক জীবন গাথা, ফকিরি ও মরমী ভাবধারা, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন আখ্যান রচিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ইসলামি সাংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, দেবনাগরীজাত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মুসলমানি নাগরী স্বকীয় ঐতিহ্যনির্ভর সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ঐতিহাসিক নিদর্শন।

নাগরী লিপির বর্তমান অবস্থা

হযরত শাহজালাল (র.) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর সিলেটে উদ্ভূত নাগরী লিপি তথা নাগরী ভাষা কয়েকশত বছর সিলেটের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখলেও বর্তমানে এই লিপি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। রাষ্ট্রীয় ভাষা ও দাফতরিক ভাষা হিসেবে ফার্সি ও বাংলার ব্যবহার নাগরী লিপি বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। তাছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠী ফার্সিকে মেনে নিলেও মুসলমানি নাগরীকে মেনে নেয়নি, কারণ তা ছিল হিন্দুয়ানি দেব নাগরী লিপির প্যারালাল চ্যালেঞ্জিং মুসলমানি লিপি। পরবর্তীতে উর্দু ভাষার প্রচলন দেশব্যাপি সিলেটি নাগরী লিপি চালু না হওয়ার অন্যতম কারণ। বর্তমানে মুসলমানদের স্বকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নির্ভর এ লিপির পুনর্জাগরণে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নাগরীর উৎকর্ষে কৃতি মনীষীগণের অবদান

নাগরীতে সূফিফকিরি ধারার সাহিত্যই রচিত হয়েছে বেশি। যাতে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির পাশাপাশি আরবি ও ফার্সি ভাষার অনেক শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং প্রকারান্তরে নাগরী লিপির মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতিরই উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্যের সব চেয়ে আলোচিত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সুনামগঞ্জের সৈয়দ শাহনুর, শাহ সৈয়দ হুসন আলম, পীর মজির উদ্দিন, আফজল শাহ, শাহ আছদ আলী, প্রমুখ। এরা সকলেই গীতি কবি। সকলেই মরমি গান রচনা করেছেন এই নাগরী লিপিতে। গবেষক ফাতেমা চৌধুরীর মতে, “সিলেটের মরমী সাধক ও কবিরা সিলেটি আঞ্চলিক বাংলা ভাষাকে পুঁজি করে জন্ম দেন সিলেটি নাগরী লিপি আর এই লিপিতে চতুদর্শ শতক থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বৎসর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অজস্র গান রচনা করে যান। সিলেটি বাংলা কবিতা, গানের বিপুল রসভান্ডার সিলেটি নাগরী লিপির ফসল। যুগ সভ্যতার এ সংকট লগ্নে আমাদেরই আত্নিক ও পার্থিব স্বার্থে সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্য পূর্ণাঙ্গরূপে পুনরুদ্ধারের আশু প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য” ।[২৫]নাগরী লিপির সর্বাধিক গ্রন্থ হচ্ছে ধর্ম বিষয়ক সংগীত, মারিফতি, মুর্শিদী ও বাউল এবং সূফিতত্ত্ব বিষয়ক পুঁথি। ষোড়শ শতকে রচিত সুনামগঞ্জের সৈয়দ হুসন আলমের ‘ভেদসার’ একখানা বিশিষ্ট মারেফতি সংগীত ও তত্ত্বগ্রন্থ। এ ছাড়া মুন্সি ইরফান আলীর রচিত ‘মফিদুল মুমিনিন’, ‘আখবা রুল ইমান’, শাহ আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরীর ‘ভেদকায়া’, ‘হাশর তরাণ’, ওয়াহেদ আলী রচিত ‘জঙ্গনামা’ প্রভৃতি গ্রন্থ ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নাগরী লিপি মাইলফলক হিসেবে গণ্য।[২৬] আলোচ্য প্রবন্ধে কৃতি মনীষীদের মধ্যে যারা নাগরী চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের সম্পর্কে এবং তাঁদের নাগরী বিষয়ক সৃষ্টি কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

মরমী কবি আফজল শাহ

সূফি সাধক মরমী কবি আফজল শাহ ওরফে আরমান আলী সিলেটের অসংখ্য সূফি সাধকদের অন্যতম যোগ্য উত্তরসূরি। সিলেট ছাতক রেল লাইনে অবস্থিত ‘আফজলাবাদ’ রেল স্টেশনটি তাঁরই নামের পূন্য স্মৃতির সাথে সম্পৃক্ত। ১২১৬ বাংলার ১৫ই ফাল্গুন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৩৪ বাংলার ২রা আষাড় ১২০ বছর বয়সে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।[২৭] শুধু সূফি সাধক এবং মরমী কবিই নন, একজন কামেল পীর হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি নাগরী হরফে ‘নুর পরিচয়’ নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। অমুদ্রিত থাকার পরও কেবল লোকমুখে প্রচারিত হয়ে ‘নুর পরিচয়’ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতকের শুরুতে এর রচনাকাল বলে গবেষকদের ধারণা। উনিশ শতকের প্রারম্ভে আফজল শাহ এর

মাজারের খাদেম শাহ মোশাহিদ আলী নূর পরিচয় গ্রন্থের একখানা বাংলা লিপান্তরের ব্যবস্থা করেন। পয়ার' ত্রিপদী, গান ও গজল ইত্যাদি মিলে গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি।[২৮] পুঁথির প্রায় অর্ধেকই পয়ার ছন্দে রচিত, বৃহদাংশ রাগ গীত সমষ্টি। পুঁথির অবয়ব জুড়ে রয়েছে নূরের সঙ্গে পরিচয় দেওয়ার অভিপ্রায়। স্রষ্টার মাহাত্ম্য,তাঁর নৈকট্যলাভের উচ্চারণ। এটি ফকিরি সাধনার এক অমূল্য তত্ত্বগ্রন্থ। দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এক চমৎকার আখ্যান।

সুরের জগতে হারিয়ে যাওয়া, চোখের জলে আপ্লুত এক মহান মরমী সাধক ছিলেন আফজল শাহ। সারারাত এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। বালিশের পরিবর্তে মাথার নীচে এক টুকরো কাঠ ব্যবহার করতেন। গান করা, গান শুনা এবং গান রচনা করা এই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তিনি আরো ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যথাক্রমে ঘণ্টানামা, বাটুরা নামা, আমুয়া নামা, কলানদর নামা, দস্তর নামা, ফিকিরি সিজরা ও রিসালায়ে মারিফাত।[২৯] তাঁর রচিত এসব মূল্যবান গ্রন্থাদি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপাদান।

পীর মজির উদ্দিন

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার বিখ্যাত সৈয়দপুর গ্রামে ১২৮৩ হিজরীর ২১ জমাদিউস সানী শুক্রবার সকালে জন্ম গ্রহণ করেন কাদেরীয়া ও চিশতীয়া তরীকার অন্যতম সূফি সাধক ও নাগরী সংস্কৃতির অন্যতম রূপকার পীর মজির উদ্দিন। প্রায় ৭০ বছর বয়সে ১৩৫৩ হিজরীর ১৫ জমাদিউস সানী মোতাবেক ১৩৪০ বাংলার ৭ই আশ্বিন সোমবার দিবাগত রাত ১ টার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩০] আধ্যাত্ম সাধনার পাশাপাশি তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছেন। নাগরী হরফে লেখা 'প্রেমালাপ' প্রথম খণ্ড, 'প্রেমালাপ' দ্বিতীয় খণ্ড, 'শাহাদাতে বুজুর্গান', 'জারী জঙ্গনামা' এবং 'ভেদ জহুর', তাঁর অমূল্য গ্রন্থ। বাংলালিপিতেও 'প্রেমরতন' এবং 'গুরুখ' নামে তিনি দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।[৩১]

পীর মজির উদ্দিনের 'প্রেমমালা' প্রথম খণ্ড বাংলায় লিপ্যান্তর করে ১৩৬৪ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পুত্র এস. জেড মনফর উদ্দিন। প্রথম খণ্ডে গানের সংখ্যা ছিল ৪৪টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৯টি, কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার উপর লেখা 'শাহাদাতে বুজুর্গান' ৮০০ পৃষ্ঠার মহাকাব্য হিসেবে গণ্য। 'ভেদ জহুর' তাঁর রচিত উচ্চ মার্গের একটি সূফি বিষয়ক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে তাঁর রচিত গানগুলোর মধ্যে রয়েছে:

"মজির কহে পাগল মনরে আর কত বুজাই, শকলের ভেদাভেদ মুরশিদের ঠাই/মুরশিদ বিনে তরিবার আর উপাএ নাই"। অনুরূপ উক্ত গ্রন্থে শতাধিক গান সংকলিত হয়েছে বলে গবেষক আসাদ্দর আলী উল্লেখ করেছেন।[৩২] মজির উদ্দিনের বাংলা লিপিতে রচিত সূফি বিষয়ক গ্রন্থ 'প্রেমরতন' ১৩৬৪ সালে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটি মুসলিম সংস্কৃতির উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য গান হলো:

"এক নিরঞ্জন বিনে দুই নাহি আর
আচার বিচার রহু আঠার হাজার
হিন্দু বলে রাধা-কিরিশনঅ দেবতা তারার
আমি ভাবি এই সবের নাহি দরকার
তন রাধা মন কানু ভাবআি দেখ মনে
রাধা কানু বিচারিআ চাও আপন তনে"।[৩৩]

হাজী শাহ পীর সুকুর আলী চিশতী

ছাতক থানার শান্তিগঞ্জ বাজার এলাকার কামারগাঁও পীর বাড়িতে ১৩২১ বাংলায় হাজী শাহ পীর সুকুর আলী জন্মগ্রহণ করেন।[৩৪] তিনি মাদরাসায় লেখাপড়া করে মারেফাতী তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁর পিতার নাম শাহ ছাবাল আলী। তার অন্ধ পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত মরমী কবি এবং শরীয়তের একজন উঁচুমাপের সূফি সাধক। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে মারেফাতের দীক্ষা লাভ করেন। শাহ ছাবাল পীরই ছিলেন তার মুর্শিদ। তাঁর ইন্তেকালের সঠিক সন জানা যায়নি। তাঁর রচিত সূফি শাস্ত্র গ্রন্থের নাম: 'এসকুল আছরার'। ১৩৯২ বাংলায় গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৬৬টি কালাম এবেং কতিপয় পদ্য নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৪ বাংলা বা ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।[৩৫] দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট (১০+৯৬)=১০৬। মোট ২৬ পঙ্ক্তির যে মোনাজাত দিয়ে গ্রন্থখানা শুরু হয়েছে, সে মোনাজাতের কিয়দংশ হলো:

"সর্বমক্তিমান খোদা কুদরত অসীম
দয়া করে ওহে দয়াল আমিত এতিম।
জোড় হাত মিন্নতী করি দরবারে তোমার
পাপীরে কর মুক্তি প্রার্থনা আমার।
আউয়াল্লে আখেরে তুমি জাহির বাতিন
তোমার কুদরতে পয়দা আছমান ও জমিন"।[৩৬] (সংক্ষিপ্ত)

চার তরিকার বিবরণ, আসমান জমিন সৃষ্টি সংক্রান্ত বিবরণ, আল্লাহ ও নবি প্রেম, যিকির-আযকার ওমুর্শিদ বন্দনাসহ অসংখ্য কালাম ও পংক্তি গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষাংশে পীর সুকুর আলী পরম করুণাময়ের দয়া কামনা করেছেন এভাবে:

হাজী সুকুর আলীর জীবনভরা, নামাজ আদায় হৈল না সারা
হায়মাবুদ উপায় কি করা, বলি আমি কাতরে
যদি দয়া করে নিজ গুনে, আমি কাঙ্গালেরে রাখো মনে
আপনার মেহের গুনে সব যাবে দূরে"।[৩৭]

ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম একটি গ্রন্থ হিসেবে 'এসকুল আছর' সর্বজন স্বীকৃত।

ফকির ওয়াহেদ আলী

ফকির ওয়াহেদ আলী সিলেটী নাগরী লিপিতে রচিত সুবৃহৎ 'গ্রন্থ জঙ্গনামা' রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ থেকে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল :

"শাকিন বসত বাড়ি শকলের জানা
চন্দবুজের বসতি এক আছে ফকির খানা
আমি অধম মুরখমতি ওআহেদ আলি নাম
ছাবডিভিশন শুনামগঞ্জ নামজাদি বড়া
অধিনের নিরাশ জান মহলে ফকির পাড়া"।[৩৮]

সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী পরগণার ষোল ঘরের অধিবাসী ছিলেন ওয়াহেদ আলী। কারবালার হৃদয় বিদারক কাহিনির কাব্যরূপ হচ্ছে তাঁর রচিত 'জঙ্গনামা'। পাঁচ শত পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ 'জঙ্গনামা' পাঠক সমাজের কাছে ছিল খুবই জনপ্রিয় ও সমাদৃত। তাঁর কাব্যভাষার একটি নমুনা :

"তীর তরকশ ছুলফা খনজর কামান
নেজাগুর্জ ছংগ পাশী আরবি নিশান

সাজান করিলা ঘোড়া দুলদুল সংকার
অতিশয় উচা ঘোড়া পর্বত আকার"।[৩৯]

'জঙ্গনামা'র রচয়িতা ফকির ওয়াহেদ আলী দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সিলেটি নাগরী লিপিতে। একটি হলো 'শহীদে কারবালা' এবং অন্যটি হলো 'হুশন শহীদ'। গ্রন্থ দু'টি মুদ্রিত হয়নি। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে 'জঙ্গনামা' ছিল কালজয়ী পুঁথি। পুঁথির কাহিনি মানুষের হৃদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দিত। এ পুঁথি শুনে অনেকেই অঝোরে কাঁদতেন। ট্রাজেডির করুণ উপাখ্যান এই পুঁথিকাব্যে দারুণ দক্ষতার সাথে তিনি চিত্রিত করেছেন। অসমান্য সৃজনশীলতায় তিনি নিপুণভাবে এঁকেছেন কারবালার মর্মান্তিক দৃশ্যপট। তাঁর রচিত গ্রন্থাদিইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য উপাদান।

নাগরী লিপির লিপিকর মহরম আলী

সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার মনোহরপুরের মহরম আলী সৈয়দ শাহনুর রচিত 'নুর নছিহত' এর লিপিকর ও পাঠক। মহরম আলীর পিতাও সিলেটি নাগরী লিপির পেশাদার লিপিকর ও পাঠক ছিলেন। উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এখনও বজায় রেখে চলেছেন মহরম আলী। তাঁর দৃষ্টিশক্তি আগের মত নেই কিন্তু তাঁর অসাধারণ কণ্ঠ এখনও বহাল আছে। সুনামগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে সৈয়দ শাহনুরের পুঁথি পাঠক ও গায়ক হিসেবে তাঁর একক খ্যাতি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মহরম আলীর নিবাস সৈয়দ শাহনুরের অন্যতম শিষ্য কুরবান শাহ এর মাজারের অদূরে।[৪০] এই এলাকায় আজো ফকির,ফকিরি ঘরনার মানুষেরা এ সব পুঁথি ও সংগীতের আসরের নিয়মিত শ্রোতা। হাওর,নদী-বিল বিধৌত উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে সুনামগঞ্জের খালেরআগাম গ্রামে কুরবান শাহের মাজার। তাঁকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষেরা এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যুগ যুগ ধরে লালন করে আসছে। এই জনপদেরই কীর্তিমান পুরুষ মহরম আলীর সুরেলা কণ্ঠে 'নূর নছিহত' এর পয়ার ও সুর আপ্লুত করে যেকোনো ভাবুক হৃদয়।

সুনামগঞ্জের আরো যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান পুরুষ নাগরী চর্চা করেছেন এবং নাগরী লিপিতে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে ইসলামি সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাদির নাম নিম্নে প্রদান করা হলো।[৪১]

রচয়িতার নাম	**গ্রন্থের নাম**
শাহ সৈয়দ হুসন আলম	ভেদসার
সৈয়দ আকবর আলী ওরফে ছাবাল শাহ	এশকে দেওয়ানা
	যৌবন বাহার
	ফানায়ে জান
মুনশি মুশাহেদ আলী	কবিতা বাউলা দুখখিত
	স্ত্রী পুরুষের আখবার
ভেলা শাহ	খবর নিশান
কুদরত উল্লা	কুদরত উল্লাহর পুঁথি
মুনশি ফজল উদ্দীন	ওলিগণের কবিতা

শাহ রহমত আলী পীর	ইলমে তাসাউফ
কারি ছমির উদ্দিন	ইবরতুল ইনছান
মোঃ হাতেম	মুহব্বত নামা কেতাব
সৈয়দ রাগীব আলী	মা'আরিফুল আহদত

বৃহত্তর সিলেটের প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধের স্মারক নাগরী লিপির প্রাচীন গৌরবগাথাকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিয়ে অনেকেই নাগরী লিপির উপর বিভিন্নধর্মী গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলার দুজন কৃতি পুরুষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তারা দুজন ইতোমধ্যে নাগরী লিপির উপর গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। প্রথমজন এস.এম গোলাম কাদির, যিনি সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা থানার চামরধানী গ্রামের সন্তান। তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "সিলেটি নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।[৪২] সিলেটি নাগরীকে জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপনের এ কৃতিত্ব ড. গোলাম কাদিরের। দ্বিতীয়জন ড. মোহাম্মদ সাদিক। যিনি ১৯৫৫ সালে সুনামগঞ্জ থানার বারারগায়ে জন্ম গ্রহণ করেন। "সিলেটি নাগরী: ফকিরী ধারার ফসল" বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য আসাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ২০০৬ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করেছে।[৪৩] এছাড়া সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসদ্দর আলী নাগরীর উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে বহু গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন (১) জালালাবাদ: ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, সিলেট ১৯৯৯ পৃ. ২৭-৩৮, (২) সূফি শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ, সিলেট ১৯৯৮ পৃ. ৩(৩) সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় জালালাবাদ ১ম খণ্ড, সিলেট, ১৯৯৬, পৃ. ৩৭-৫৩ (৪) সিলেট জেলা পরিক্রমা ১৯৯৪ পৃ. ৪৩ প্রভৃতি।[৪৪]তাছাড়া সুনামগঞ্জের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই তাদের গৌরবোজ্জল অতীতকে জাগ্রত করার প্রয়াসে নিয়োজিত রয়েছেন। নাগরী লিপি ও তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা, চর্চা ও সংরক্ষণ তাই জাতিসত্তার গৌরব সন্ধানেরই নামান্তর। এ বোধ বিশ্বাসে এবং চেতনায় অধুনালুপ্ত এ বর্ণের সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিচর্যায় প্রত্যেককে এগিয়ে আসা উচিত।

উপসংহার

সিলেটি নাগরী সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিকস্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ভাষা ও লিপি। কালের আবর্তে তা হারিয়ে গেলেও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রভাব কোনো অংশেই কম ছিলনা। হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলে এই লিপির উদ্ভব। এই নাগরী লিপি ছিল সিলেটের মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক স্বধীনতার অনন্য নিদর্শন। এই লিপি কেবল একটি লিপিই ছিলনা বরং তা ছিল একটি চেতনা বা কালচার। সিলেটি নাগরী ভাষা ও লিপি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

১ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা*: উত্তরাধিকার ও মুসলমানী নাগরী,(সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিচার্স : লন্ডন, ১৬ইঅক্টোবর, ২০০১), পৃ.২২-২৩

২ ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* (ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯১),পৃ. ১৪৬-১৪৭

৩ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত,পৃ. ৬৬

৪ মোহাম্মদ সাদিক, 'সিলেটি লিপি ফকিরি ধারার সোনালী ফসল', সিলেট, আল-ইসলাহ, এপ্রিল-ডিসেম্বর২০০০, পৃ.১৭৮

৫ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৬ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী , পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৭ Dr. Md. Abdul Musabbir Bhuiya, *JALAL VADI NAGARI* (Sylhet, August 2000), P. 22

৮ Dr. Md. Abdul Musabbir Bhuiya, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৯ Dr. Md. Abdul Musabbir Bhuiya, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১০ মোহাম্মদ সাদিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

১১ দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী,*শিকড়ের সন্ধানে শিলালিপি ও সনদে আমাদের সমাজ চিত্র* (ঢাকা, ১০ ফেব্রয়ারী ২০০১, পৃ- ২৭

১২ আরাকান রাজসভার সমরমন্ত্রী ছিলেন বৃহত্তর সিলেটের দিনার পুরের অধিবাসী হযরত শাহজালাল রে.) এর অন্যতম সঙ্গী দেওয়ান শাহ তাজ উদ্দিন কুরায়শীর বংশধর। [আসমা চৌধুরী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে সিলেট* (এল্যাইট প্রিন্টার্স: ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ৬৯]

১৩ মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাংঙ্গালী মুসলিম কবি। রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান আমাত্য, 'চন্দ্রবতী' কাব্যের রচয়িতা ও মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতি' কাব্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সমরমন্ত্রী বড়খানের পুত্র। [দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস*, (ই.ফা.বা.) ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১২৮

১৪ তরফের অধিবাসী হযরত শাহজালাল (র.) এর সফরসঙ্গী সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসলার বংশধর। আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। মহাকবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে ' সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামান' রচনা সমাপ্ত করেন। [ড.শরীফ উদ্দিন, *হযরত শাহজালালের সিলেট বিজয়, সিলেট*, দৈনিক জালালাবাদী, ১০ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৩]

১৫ দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার সিলেট*, জালালাবাদ: ঐতিহাসিক রূপরেখা, ঢাকা, ৩রা মে ২০০৪ ইং, পৃ.২৬

১৬ অধ্যাপক ড.আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*(বাংলা একাডেমী: ঢাকা, ১৯৯৪), পৃ. ১৫০

১৭ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৮ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১৯ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

২০ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

২১ দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৮৪

২২ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

২৩ ফজলুর রহমান,পূর্বোক্ত, পৃ ৮৫

২৪ ফজলুর রহমান,পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

২৫ ফাতেমা চৌধুরী, *সিলেটি নাগরী লিপি সমীক্ষা*, ঢকা: উৎস প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১৭২

২৬ মোস্তফা সেলিম, *সিলেটি নাগরীলিপি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*(ঢাকা: আত্মপুরান, অক্টোবর ২০১৮), পৃ. ৪৬-৪৭

২৭ মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, *সূফী শান্ত গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ*(সিলেট: তাইয়্যীবা প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ৫

২৮ মুহাম্মদ আসদ্দর আলী,পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

২৯ মোস্তফা সেলিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

৩০ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান,*সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি*(নিউ এমদাদিয়া পাবলিকেশন্স: ঢাকা, ১৯৯৬),পৃ. ৪৯

৩১ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান,পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

৩২ *আসাদ্দর রচনা সমগ্র* দ্বিতীয় খণ্ড(দ্য এথনিক মাইনরিটিজ অরিজিন্যাল হিস্ট্রি এন্ড রিসার্চ সেন্টার, লন্ডন, ইউকে, ফেব্রুয়ারী২০০৩), পৃ. ৩২

৩৩ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান,*সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৩৪ মুহাম্মদ আসদ্দর আলী, *সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ*(সিলেট, ১৯৯৮), পৃ. ১৪৪

৩৫ মুহাম্মদ আসদ্দর আলী,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

৩৬ মুহাম্মদ আসদ্দর আলী,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

৩৭ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, *সিলেট বিভাগের পাঁচশত মরমী কবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

৩৮ মোহাম্মদ সাদিক, *সিলেটি নাগরী: ফকিরি ধারার ফসল* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৮), পৃ. ১৩২

৩৯ সৈয়দ মোর্তাজা আলী, *প্রবন্ধ বিচিত্রা*(ঢাকা, ১৯৬৭), পৃ. ১৬৬

৪০ মোহাম্মদ সাদিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

৪১ *সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থের 'নাগরী লিপিতে রচিত পুঁথি ও বই এবং লেখকের তালিকা' শীর্ষক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৮৪-১৮৯

৪২ গোলাম কাদির, *সিলেটি নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৯৯), পৃ. লেখক পরিচিতি

৪৩ মোহাম্মদ সাদিক, পূর্বোক্ত, পৃ. লেখক পরিচিতি

৪৪ দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৭.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ০৭.১১.২০২৩